বাংলার ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) : পরিপ্রেক্ষিত ও মতাদর্শ

ড. আবদুল বাছির*

সার সংক্ষেপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বৃটিশদের বাংলা দখলের সাথে সাথে দক্ষিণ এশিয়ায় ঔপনিবেশিকরণ শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পুঁজিবাদী ইংরেজ শক্তির জয় লাভের ফলে বাংলার স্বাধীন নবাবীর অবসান ঘটে। নতুন শাসনের চাহিদা মোতাবেক বাংলার সর্বক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়। সরকারের পরিবর্তিত নীতির কারণে এদেশের সনাতন শ্রেনীসমূহ বিশেষত ফকীর সন্ন্যাসীশ্রেণী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধর্মীয় অনুশাসনের দিক হতে ফকীর সন্ন্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কালক্রমে উভয়ের মধ্যে আদর্শগত ও সাংস্কৃতির ঐক্য সৃষ্টি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনসমূহ ফকীর সন্ন্যাসীদের মধ্যে মিলনের সাধারণ ক্ষেত্র তৈরী করে। একই নেতৃত্বের অধীনে তারা সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। ধর্ম তাদের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অন্তরায় তৈরী করেনি। তাদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় নিঃস্ব কৃষক, তাঁতি, পতিত জমিদার ও মুঘল সরকারের বেকার সৈন্যদল। এই বিদ্রোহ ছিল সরকারের নির্বিচারে শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে সংশয় আছে। তবে এই বিদ্রোহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব ও পরামর্শ প্রমাণ করে ফকীর সন্ন্যাসীরা রাজনীতির পথ পেরিয়ে অর্থনৈতিক ও আদর্শগত মুক্তির প্রত্যাশী ছিল। তারা এদেশের সনাতন প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফকির সন্ন্যাসীদের নানাবিধ অসুবিধাসমূহ ছিল ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সাফল্যের অন্তরায়। তবে এই বিদ্রোহ ছিল পরবর্তী সময়ের সকল বিদ্রোহের গৌরবময় প্রেরণার উৎস।

Abstract

During the middle of the eighteenth century, the British occupied Bengal and with it the process of colonization began in South Asia. The new rule introduced in the socio-economic and political spheres unsettled the traditional way of livelihood of all classes, especially the peasants and the Fakir Sannaysi. In protest of this inauspicious situation a series of peasant movements were organized in Bengal that almost threatened the stability of the colonial government. Among these, Fakir Sannaysi movement was a first revolt against the British rule in Bengal. The British East India Company occupied Bengal mainly to exploit its resources for commercial benefit and profit. To achieve these aims the company imposed a new land revenue system and encouraged the cultivation of cash. Soon it radically changed agrarian relations, reducing those who were once occupancy tenants to share-croppers or landless agricultural labourers. The organized and violent agrarian movements in Bengal were deeply entrenched in the socio-economic conditions of rural Bengal. The first of this kind after the establishment of Company rule was the Fakir-Sannaysi movement. In desperation, the Fakir-Sannaysi reacted violently to vent their grievances, and also to restore the pre-colonial economic system or old order by this movement. Therefore it may be regarded as social protest movement and sources of the inspiration for the subsequent peasant revolts of Bengal.

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে মুঘল রাজত্বের ধ্বংসস্তুপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। আমরা সকলেই অবগত আছি যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগঠন একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। আপাতঃ দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া যেভাবে দৃষ্ট হয় ঠিক সেভাবে এর ইতিহাস তৈরী করা প্রায়শ কঠিন। কারণ স্থানীয়দের অসচেতনতার বিপরীতে ঔপনিবেশিক কর্মচারী-কর্মকর্তাদের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিরামহীন লেখনী এখানে একটি গোধুলী পর্যায় তৈরী করে। এসব অজ্ঞাতপূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদনই আমাদের স্থানীয় ইতিহাসের প্রধান উৎস। নতুন শাসনের চাহিদা মোতাবেক পরিবর্তিত হয় দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতাবিন্যাস। এই সব পরিবর্তনে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? দেশবাসী কি ঐসব পরিবর্তনে বৃটিশ আধিপত্যের চ্যালেঞ্জ করেছিল? যদি করে থাকে তবে এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপ্তি কি ছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তর এতদিন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। আধুনিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, দেশবাসী (কৃষক-শ্রেণী) সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে সম্পূর্ণ উদাসীন বা নির্লিপ্ত ছিল না। প্রয়োজনে সরকারি নীতির প্রতিরোধ এমন কি সশস্ত্র সংগ্রামে পর্যন্ত লিপ্ত হতে তারা দ্বিধা করেনি। বাংলার ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০ খ্রী:), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৪-৩৩), দ্বিতীয় চোয়ার বিদ্রোহ(১৭৯৮-৯৯) এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) এর প্রমাণ। অষ্টাদশ শতক বাংলার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এ শতকে মহান মুঘল সাম্রাজ্যের মানসিক বিপর্যয়, ইংরেজিদের দেওয়ানী গ্রহণ (১৭৬৫) ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রী:) ও চিরস্থায়ীসহ বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। বাংলায় কোম্পানির শাসন প্রসূত অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে সকল ফকীর ও সন্ন্যাসীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তাদের পরিচয় নিয়ে যেমন সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তেমনি এটি কৃষক বিদ্রোহ ছিল কিনা তা নিয়েও মত পার্থক্য বিদ্যমান। আলোচ্য প্রবন্ধে এসব প্রশ্নের সদোত্তর প্রয়াসসহ এর পটভূমি , মতাদর্শ ও তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলার ফকীরগণ ছিলেন সূফী সম্প্রদায়ের মাদারীয়া শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিরিয়া হতে আগত সূফী-সাধক বদি উদ্দীন শাহ-ই-মাদার।[১] তিনি পঞ্চদশ শতকে ভারতে আসেন এবং উত্তর ভারতে তার সূফী মতবাদ প্রচার করেন। ১৪৩৬ সালে তিনি অযোধ্যার কানপুর জেলায় মাখনপুরে মৃত্যুবরণ করেন। শাহ্ মাদারের সূফী মতবাদ বাংলায় প্রসার লাভ করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাহ্ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানা। সম্রাট শাহ জাহান-পুত্র সুবাদার শাহ সুজা ১৬৫৮ খ্রী. বাংলায় মাদারীয়া সুফী নেতা শাহ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানাকে বিশেষ অধিকার সম্বলিত একখানা সনদ দিয়েছিলেন। এই সনদে উল্লিখিত অধিকার সমূহের প্রকৃতি ও চরিত্র এ মাদারীয়া সূফী সম্প্রদায়ের প্রবল প্রভাবও প্রতিপত্তির কথা প্রমাণ করে। বাংলার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই সূফী মতবা প্রসার লাভ করে। দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ থানায় হাসান শাহ সুরিয়ার আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে।[২] ফার্সি লিপি বিশেষজ্ঞ মৌলভী আব্দুল ওয়ালী মনে করেন যে, এই সূফী ফকিরদের অস্তিত্ব প্রাচীন সূফীবাদ ও হিন্দুযোগী আচার-আচরণের মিশ্রণের মধ্যে নিহিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মজনু শাহ বুরহানা। অন্যদিকে সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু-যোগী। অষ্টম শতকে বেদান্ত দার্শনিক শংকরাচার্য দশনামী সন্ন্যাসবাদের প্রবর্তন ঘটান। এদের মধ্যে বিভিন্ন শাখা ছিল। সূফী ফকীরদের মত সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাখা অনুযায়ী তাদের নামের শেষে 'গিরী' বা 'পুরী' উপাধি ধারন করতেন।[৩] সন্ন্যাসীদের অবস্থান ও জীবিকা নির্বাহের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরকারি বিবরণীতে রয়েছে। সমসাময়িক উৎসব সমূহে এবং সরকারি দলিল দস্তা-বেজে আচরণগত প্রকৃতিগত কারণে ফকীরও সন্ন্যাসীদের এক করে দেখানো হয়েছে।[৪] অনেক ক্ষেত্রে তাদের কেবল মাত্র 'ফকীর' অথবা 'সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর কারণ ছিল এদের মধ্যকার আচরণগত সাদৃশ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সূফীবাদ ভারতে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে এক সেতু বন্ধন রচনা করে। কেননা বেদান্ত দর্শন সুফীবাদের মধ্যে তত্ত্বগত সাদৃশ্যের জন্য হিন্দু-মুসলমান সাধকেরা একে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেন।[৫] এই ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল খুবই প্রকট যা তাদের ঐক্যের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক[৬] হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকীরের আচার-আচরণ এবং ভক্তি বিশ্বাসে যে পার্থক্য টানার চেষ্টা করেছেন তা যথার্থ নহে।

প্রকৃতপক্ষে ফকীর ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য তথা ধর্মীয় ও সামাজিক সম্মিলনের প্রভাব। সন্ন্যাসীদের অবস্থান ও বসবাস সম্পর্কে যামিনী মোহন ঘোষ বিশধ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সরকারি বিবরণীতেও ফকীর সন্ন্যাসীদের বাংলায় স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।[৭] ফলে রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য সঠিক নহে যে, বিহার ও মধ্য প্রদেশ হতে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী উত্তর বঙ্গের নানা স্থান লুঠতরাজ করে ফিরত।[৮] এ বক্তব্য গ্রহণ করলে ধরে নিতে হয় ফকীর সন্ন্যাসীরা ছিল যাযাবর শ্রেণীর। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ জমির মালিক ও মহাজনী ব্যবসা করতেন। আবার কেউ কেউ ধর্মীয় আখড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও ভিক্ষা বৃত্তির (মুষ্টি ভিক্ষা) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্যদিকে ফকীরদের সম্পর্কে জানা যায় যে, রংপুর জেলায় বহু সংখ্যক মাদারীয়া সুফী স্থানীয় কৃষক-অধিবাসী হিসেবে বসবাস করতেন এবং তাদের মধ্যে কারো কারো আচরণ ছিল হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো।[৯] এছাড়া ফকীরদের একাংশ ছিল বিবাহিত এবং কিছু লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক। ফকীর- সন্ন্যাসীরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি দল। তাই সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত যে, ফকীর-সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বাংলারই অধিবাসী। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে তাদের জীবন শুরু হলেও কালক্রমে তাদের গার্হস্থ্য জীবন পদ্ধতি স্বাভাবিক ও স্থায়ী বসতি লাভ করে। ধর্মের অনুশাসনের দিক হতে ফকীর-সন্ন্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কালক্রমে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অভিযোগ সমূহ ফকীর-সন্ন্যাসীদের মধ্যে মিলনের সাধারণ ক্ষেত্র তৈরী করে। উভয় সম্প্রদায় একক সংগঠনে পরিণত হন। জনাব মুহাম্মদ আবু তালিব মনে করেন যে, লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াফতির পালা ফকীর-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহী করে তোলে।[১০] তবে এই কারণটি ১৭৯৩ খ্রী. পূর্বে খুব জোরালো কারণ ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া মুঘল সরকার মদদই , ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর ও পীরপাল প্রভৃতি লাখেরাজ প্রদান করতেন বটে। কিন্তু বাংলার প্রত্যেক ফকীর যে তার অধিকারী ছিলেন এমন প্রমাণ বিরল। বাংলার ফকীর সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল ১৭৬৩ খ্রী: হতেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ফকীর-সন্ন্যাসীদের স্বাধীন গতিবিধিও কার্যকলাপে বাধা আরোপিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ব্যাহত হতে থাকে ফকীর-সন্ন্যাসীদের ধর্মাধিনুষ্ঠানে যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা। ধর্মস্থান বা তীর্থস্থান পরিদর্শন ভারত উপমহাদেশের একটি অতি প্রাচীন সামাজিক ও আত্মিক অধিকার। হিন্দু সন্ন্যাসীদের কুম্ভ মেলায় যোগদান , গঙ্গা ও করতোয়ায় স্নান, অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্ম নদে স্নান এবং বগুড়ার মহাস্থানগড় ও কানপুরের মাজার জিয়ারত ইত্যাদি ছিল ফকীরদের পূণ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানির কর্মচারীগণ ফকীর-সন্ন্যাসীদের এই সকল তীর্থ স্থান পরিদর্শনের বিষয় সন্দেহের চোখে দেখতেন। সরকারি জরিপ কর্মের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মেজর জেমস রেনেল (১৭৭৭ খ্রী.) মহাস্থান দরগা পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেন যে, এই সমস্ত দরগা ছিল প্রকারান্তরে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল।[১১] সম্ভবতঃ কোম্পানির বিরুদ্ধে ফকীর-সন্ন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে এই সমস্ত তীর্থস্থান পরবর্তীকালে অস্ত্র লেনদেনের কেন্দ্র হয়ে উঠে। সরকারি নথিপত্রের উল্লেখ রয়েছে যে, ফকীর-সন্ন্যাসীগণ প্রতি বছর তীর্থ গমনের উদ্দেশ্যে ভারত ও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে ভ্রমণ করতেন। ১৭৭২ সালে ফকীর নেতা মজনু শাহ নাটোরের রাণী ভবানীকে এক চিঠিতে জানান যে, ইংরেজ কোম্পানি তাদের তীর্থ যাত্রাতে বাধা দিচ্ছে। এ আবেদন ফকীর -সন্ন্যাসী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন মজনু শাহ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মজনু শাহ ছিলেন।

মাদারীয়া সুফী সম্প্রদায়ের নেতা। ফকীর-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তার গ্রহনযোগ্য, সামাজিক মর্যাদা এবং তার অপ্রতিহত নেতৃত্বের প্রতি কোম্পানি সরকারের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নেতৃত্ব আসনে সমীসীন হয়েছেন এরূপ ধারণা এখন প্রমাণিত। বাংলার ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকৃতির আন্দোলনে ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্ব প্রদানের উদাহরণ সর্বজনবিদিত।[১২] ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতৃত্বের প্রকৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি প্রশাসন প্রথমে ফকীর-সন্ন্যাসীদের তীর্থ যাত্রার বাধা দেয় এবং পরে আইন

প্রণয়নের মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞাকে সুদৃঢ় করে।[১৩] ফকীর-সন্ন্যাসীরা এ ব্যবস্থাকে ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচারের সাথে যুক্ত হয় ফকীর সন্ন্যাসীদের অর্থনৈতিক অভিযোগের। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ফকীর-সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষা বৃত্তির (মুষ্টি সংগ্রহ) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং কালক্রমে তা অধিকারে পরিণত হয়। বাংলায় কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর একদিকে রাজস্ব আদায়ে অত্যাচারে এবং অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ফলে পল্লী জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। এরই ফলে ফকীর-সন্ন্যাসীগণ দু'দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হন; (ক) সাধারণ হিন্দু-মুসলমান জনগণ বিভিন্ন দরগা, মাযার ও তীর্থ স্থান পরিদর্শন শেষে কিছু অর্থকরী প্রদানের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু বৃটিশ নীতির কারণে সে সামর্থ জনগণ হারিয়ে ফেলে এবং (খ) আর্থিক দৈনতার কারণে পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের মুষ্টি ভিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় যা থেকে ফকীর-সন্ন্যাসীদের নিয়মিত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতির জন্য ফকীর-সন্ন্যাসীরা সরকার ও জমিদারদেরকে দায়ী করেন। দিনাজপুরের তৎকালীন কালেক্টর হ্যাচ স্বীকার করেছেন যে, নিম্ন শ্রেণীর রায়তদের অবলুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ফকীর-সন্ন্যাসীদের দাবী অগ্রাহ্য হয়। প্রতিবাদ স্বরূপ তারা জমিদারদের বাড়ী, কাছারি ও কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করে।[১৪] তারা জমিদার ও সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আবাসিক ফকীরেরা জমিদারদের কাছ থেকে তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ে অধিকতর তৎপর হয়ে ওঠেন। ফকীর-সন্ন্যাসীরা ছিল এমন একটি শক্তি যার বিরোধীতার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তি উভয়েই । আঠারো শতকের শেষে উত্তর বঙ্গে অনেক পরস্পর বিরোধী শক্তি ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এদের একটি। সব মিলে গঠন করে একটি জটিল ও অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা। কৃষি উৎপাদনের উপর দাবী ছিল কৃষক, জমিদার, রাষ্ট্র, আমলা শ্রেণী ও ফকীর-সন্ন্যাসীদের এবং ঐ দাবীর মধ্যে নিহিত ছিল তথাকার রাজনৈতিক অস্থিরতার বীজ। এসময় ফকীর সন্ন্যাসীদের সাথে সাথে যোগ দেয় নিঃস্ব কৃষক, তাঁতি, পতিত জমিদার ও মুঘল সরকারের বেকার সৈন্যদল।[১৫] প্রকৃতপক্ষে বেকার সৈন্যদল ও ভূমিহীন কৃষক জীবিকা নির্বাহের শেষ উপায় হিসেবে ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। ১৭৭৩ সালে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিঃ) পূর্বে এই আক্রমণের তীব্রতা তেমন ব্যাপক না হলেও দুর্ভিক্ষের পরে উদ্ভূত মারাত্মক অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ফকীর-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব গোমস্তার বাড়ী আক্রমণ ছাড়াও কোম্পানির সহযোগী এদেশীয় প্রতিনিধিরাও ছিল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ফকীর সন্ন্যাসীদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে ছিল তরবারী, বর্শা, গাদাবন্দুক ও লাঠি ইত্যাদি। ফকীরদের মধ্যে কেবলমাত্র মজনু শাহ সহ কয়েকজন নেতা ঘোড়ায় চড়তেন, যা ছিল বিদ্রোহীদলের নেতৃত্বের প্রতীক। দলের সর্দারদেরকে 'হাকিম' বা 'শাসনকর্তা' বলে অভিহিত করা হত।[১৬] আকস্মাৎ আক্রমণে কোম্পানি সৈন্যদলকে বিব্রত করা ছিল ফকীর-সন্ন্যাসীদের রণ-কৌশলের একটি প্রধান অংশ। কোম্পানির সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে যুদ্ধের শেষে অথবা ফকীর-সন্ন্যাসীগণ বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে দ্রুত ঐ অঞ্চল ত্যাগ করতেন। ফকীর-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহী তৎপরতা পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সংগঠন ও সমাবেশ ইত্যাদি তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে তাদের বিদ্রোহের গতি প্রকৃতি, দীর্ঘকালীন সক্রিয় তৎপরতা তাদের পরিকল্পনা সমাবেশ ও সংগঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সুদৃঢ় করে। কোম্পানির সৈন্যদল সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ফকীর-সন্ন্যাসীদের গুপ্তচর ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ। ১৭৬৩ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ফকীর-সন্ন্যাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্প্রসারিত হয়েছিল ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ ও পুর্ণিয়া জেলায়। এই জেলাগুলোতে তাদের সাংগঠনিক শক্তি ছিল প্রবল। তবে সমগ্র উত্তর বঙ্গ ছিল ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র। এই আন্দোলনের তীব্রতা এতই বেশী ছিল যে কোম্পানীকে বাংলার প্রতিটি জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছিল।

১৭৬৩ সালে সর্বপ্রথম বাখেরগঞ্জে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কুঠি ফকীর-সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সন্ন্যাসীগণ তথাকার ফ্যাক্টরী প্রধান কেলীকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। একই বছর ফকীরগণ ঢাকার ফ্যাক্টরী

আক্রমণ করে তা দখল করেন। এই আক্রমণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে ঢাকায় ফ্যাক্টরী প্রধান লেষ্টার কর্মস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যান। শেষে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ফকীরদের হাত থেকে ঢাকা ফ্যাক্টরী কে পুনরুদ্ধার করেন।[১৭] একই বছর সন্ন্যাসীগণ রাজশাহীর রামপুরের বোয়ালিয়ায় কোম্পানির ফ্যাক্টরী প্রধান বেনেটকে হত্যা করে। উত্তরবঙ্গে ফকীর-সন্ন্যাসী তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেঞ্জিকে প্রেরণ করা হয়। এসময় সন্ন্যাসীগণ মালদহের রেসিডেন্ট বারওয়েল কর্তৃক প্রেরিত এজেন্ট মার্টেলকে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেঞ্জির এই সন্ন্যাসী দলের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে সন্ন্যাসীদল নেপালের দিকে পালিয়ে যায়। ১৭৭০ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় ফকীর-সন্ন্যাসী আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। ১৭৭১ সালের দিকে ক্যাপ্টেন জেমস্ রেনেল ছিলেন পাবনা অঞ্চলে জরিপের কাজে নিয়োজিত। তিনি পাবনার সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ বেলকুচি হতে জানান যে, ফকীরগণ সংখ্যা অনেক এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ এই জেলার বিভিন্ন স্থানে সমবেত হচ্ছে।[১৮] কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই তথ্যের ভিত্তিতে রাজশাহী ও দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করেন। ১৭৭১ সালে লেফটেন্যান্ট ফেলথামের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দ গঞ্জের পথে ফকীর-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করেন। হঠাৎ আক্রমণে ফকীর-সন্ন্যাসীগণ পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করেন। এ সময় অশ্বপৃষ্ঠে মজনু শাহ শতাধিক নিরস্ত্র ও আহত অনুসারী নিয়ে মহাস্থানগড়ের দিকে পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর মহাস্থানগড় এলাকায় স্থায়ীভাবে কোম্পানির সৈন্য মোতায়েনের প্রয়োজন হয়। রাজশাহী জেলায় ফকীর-সন্ন্যাসীদের তৎপরতার প্রচন্ডতা লক্ষ্য করা যায় ১৭৭২ সালে, যখন মজনু শাহ সশস্ত্র অনুচর নিয়ে উত্তর বঙ্গে প্রচন্ড সংঘর্ষে লিপ্ত। রাজশাহীতে অবস্থানরত কোম্পানির সুপার ভাইজারের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী কয়েকশ সশস্ত্র অনুচর কোম্পানির আদায়কৃত খাজনার অর্থ লুট করে নিয়ে যায়, এমনকি তাদের পক্ষে পরগণার কাছারি দখল করে রাখাও অসম্ভব ছিল না। নাটোরে অবস্থানরত কোম্পানির সুপারভাইজারের পত্রানুযায়ী ফকীরদল ছিল তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক ও কামানে সজ্জিত। এ বক্তব্যে কিছুটা অতি রঞ্জন লক্ষনীয়। কেননা কামানের ব্যবহার ফকীরদের পক্ষে সম্ভবপর মনে হয় না। একই বছর রংপুরে সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহত্মক তৎপরতার তথ্য প্রদান করেন রংপুরের সুপারভাইজার পার্লিং, যিনি এই ঘটনার কয়েক মাস পরই সন্ন্যাসীদের হাতে নিহত হন।[১৯] ১৭৭৬ সালে পুনরায় উত্তর বঙ্গের বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুরে ফকীর-সন্ন্যাসী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বগুড়া জেলায় কোম্পানির সুপারভাইজার নিযুক্ত হয়ে আসেন গ্লাডউইল। তিনি ফকীর-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই অঞ্চলে কোম্পানির সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু কোম্পানির পক্ষ হতে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট রবার্টসনের নেতৃত্বে কোম্পানি একদল সৈন্য প্রেরণ করে, যাদের সাথে ফকীর-সন্ন্যাসীদের তীব্র সংঘর্ষ সংগঠিত হয়।

ময়মনসিংহের আলাপসিংহ পরগণায় ১৭৮২ সালে ফকীর-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময় পুখরিয়া নামক স্থানে মজনু শাহের সাথে কোম্পানির সৈন্যদলের সংঘর্ষ হয় এবং পরাজিত মজনু শাহ তার অনুসারীদের নিয়ে মধুপুর জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ১৭৮৫ সালের দিকে মজনু শাহ পুনরায় মহাস্থানগড়ের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় কোম্পানির সৈন্য দলের সাথে যুদ্ধে তার পরাজয় ঘটে। পরবর্তী বছর ফকীরগণ স্বতন্ত্র দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমনাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হন। মজনু শাহ্ ময়মনসিংহ জেলা সংলগ্ন অঞ্চলে এবং মুসা শাহ শক্তি ও ক্ষমতাকে বিচ্ছিন্ন করে অতিমাত্রায় ব্যস্ত করে তোলা। ১৭৮৬ সালে মজনু শাহের সাথে কোম্পানির সৈন্যদলের পরপর দুটি মারাত্মক সংঘর্ষ হয়। এ সময় লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের সাথে কালেশ্বর এলাকায় সংঘর্ষ মজনু শাহ তাঁর বহু সংখ্যক অনুসারীকে হারান। পরবর্তীতে মজনু শাহ নিজে কোন অভিযান পরিচালনা করেননি। সম্ভবতঃ ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার মাখনপুরে মজনু শাহ মৃত্যবরণ করেন। মজনু শাহের উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন মুসা শাহ, চেরাগ আলীশাহ, পরাগল শাহ, সোবাহান শাহ, মাদার বক্স, জরি শাহ, করিম শাহ প্রমুখ যারা অনেকেই ছিলেন মজনু শাহের আত্মীয়। ফকীর-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পুরোধা মজনু শাহ মারা যাবার পরও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরীগণ পুরো আঠারো শতক পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তবে ক্রমশঃ

এই আন্দোলনের গতি হয়ে পড়ে স্থিমিত। এই আলোচনার পর একটা প্রশ্ন ওঠা সংগত যে ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কি ছিল? এটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। ফকীর-সন্ন্যাসীদের অভিযোগ ছিল প্রথমত: অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন। কিন্তু এই উৎপীড়ণের অবসানকল্পে তারা যে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেন সেখানে একটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হতে পারে কোম্পানির শাসনের অবসান। তবে সমসাময়িক উৎস সমূহে এমন কি রানী ভবানীর নিকট লিখিত মজনু শাহের চিঠিতেও এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। কোম্পানির শাসনে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের অবসান ব্যতীত। এই বিদ্রোহের অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুপস্থিত। কোম্পানির শাসন তারা চায়না। কিন্তু পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থা বলবৎ বা নতুন কোন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট নয়।[২০] একে কেবলমাত্র কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। ১৮০০ সালের পর এই বিদ্রোহ ক্রমান্বয়ে স্থিমিত হয়ে পড়ে। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিচালিত এই আন্দোলনে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল ফকীর-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা । বাংলা ব্যতীত বিহারেও তাদের আক্রমনাত্মক তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়েছিল। বাংলাতে ফকীর-সন্ন্যাসী আন্দোলন দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে এবং প্রায় সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রসার লাভ করেছিল। তাহলে কাংখিত ফলাফল তারা পেল না কেন? এর কারণ ছিল বহুবিধ । তবে একটি কারণ ছিল বহুবিধ। তবে একটি কারণ ছিল প্রধান। তা হল ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলার একটি শক্তিশালী শ্রেণী বিরোধিতা করেছিল, যারা ছিলেন মূলতঃ যুগান্তর যুগের উঠতি পুঁজিপতি। প্রকৃতপক্ষে তখন বাংলায় কান্তবাবু, দেবী সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, রামকান্ত রায়, দুলাল রায় ও জয় নারায়ণ ঘোষালের মত বেনিয়া ও মুৎসুদ্দির অভাব ছিলনা এবং ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল প্রধান এই শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে। কেননা কোম্পানির শাসন ও শোষণ তাদের স্বার্থের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ছিল। অন্যদিকে এই বিদ্রোহে কতিপয় জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের সাহায্য দানের প্রমাণও বিরল নয়।[২১] ফকীর-সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকারী কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ প্রায়ই তাদের কর্ম তৎপরতা জমিদারের অসহযোগিতা সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ উত্থাপন করতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৩ সালের ১২ আগস্ট নতুন আইন প্রণীত হয়, যাতে জমিদারদের করণীয় সম্পর্কে নতুনভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়।[২২] কিন্তু এই রেগুলেশনটি যে সম্পূর্নরূপে কার্যকরী হয়নি, তা কোম্পানির কর্মচারীদের সংশয় ও অন্যান্য বক্তব্য হতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। জমিদার শ্রেণী ব্যতীত ফকীর-সন্ন্যাসীগণ স্থানীয় জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। দিনাজপুরের তৎকালিন কালেক্টর লিখেছেন যে, গ্রামবাসীরা বিপদের সময় ফকীর-সন্ন্যাসীদের আশ্রয় প্রদান করে। তারা এই তৎপরতা হতে বিরত না হলে ফকীর-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে না।[২৩] ফকীর-সন্ন্যাসীদের সাথে গ্রামবাসীদের একাকার হয়ে যাবার তথ্য যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি এই তথ্য নিঃসন্দেহে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করে। এদেশের বৃহত্তর সমাজে ফকীর-সন্ন্যাসী একটি সম্প্রদায়, দেশের চরম আর্থিক দুর্দশা ও শাসনের যাতাকলে ফকীর-সন্ন্যাসীদের স্বার্থ ও তাদের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের সাথে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফকীর বা সন্ন্যাসীগণ কখনও এককভাবে এবং কখনও যৌথভাবে অথবা কখনও উভয়দলেই কোন উল্লেখযোগ্য নেতা ছাড়াই বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন। প্রকৃতপক্ষে এর কারণ ছিল তাদের মধ্যকার আর্দশগত ঐক্য। ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন গবেষক ঔপনিবেশিক সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে একে দুস্য, 'ডাকাত' বা 'দুস্কৃতকারী' দের তৎপরতা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৪] আবার কোন কোন লেখক ও গবেষক এই বিদ্রোহকে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত বলে অতিরঞ্জনও করেছেন।[২৫] যারা একে 'ডাকাত' ও 'দুস্কৃতকারী' দের তৎপরতা বলে আখ্যায়িত করেছেন, তারা নির্বিচারে সরকারি নথিপত্রের উপর নির্ভর করেছেন। ফলে সরকারের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্য মিশে গিয়েছে। অন্যদিকে যারা ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে চান, তারা কোম্পানির দলিলপত্রে উল্লিখিত

'ডাকাত' ও 'দুস্কৃতকারী' ইত্যাদি শব্দের সম্পূর্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। দলিলপত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন শব্দের সঠিক অর্থের জন্য স্বনির্বাচিত শব্দগ্রহণ করেছেন এবং গবেষকদেরকে দলিল উল্টানোর পরামর্শ দিয়েছেন,[২৬] যা বিপদজনক। প্রকৃতপক্ষে ফকীর-সন্ন্যাসীগণ তাদের পেশাগত স্বার্থ ও আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষনের জন্যই সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছিল। দেশরক্ষা বা জাতীয়তাবাদ তাদের লক্ষ্য ছিল না। ১৭৬৩ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই সশস্ত্র বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় যে মুহূর্তে গ্রামীণ কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল, যখন কৃষক সমাজ সম্মুখীন হয়েছিল এক অজ্ঞাত শত্রুর, যাদের শক্তি ছিল অপ্রতিরোধ্য তখন বাংলার ফকীর-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল কোম্পানির।

উপরোক্ত নির্বিচার শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম স্বত:স্ফূর্ত সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ। ফকীর-সন্ন্যাসীদের শক্তিশালী সংগঠনের অভাব, ধর্মীয় ভেদাভেদ, অনভিজ্ঞতা, উন্নত চেতনাবোধের অভাব, এবং অন্যান্য অগ্রসর শ্রেণীর অসহযোগিতা এবং পরবর্তীকালে নেতৃত্বের অভাবে তাদের বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে ইংরেজ কোম্পানি সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণে পরিচালিত এই বিদ্রোহের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিদ্রোহ ছিল পরাধীন বাংলার পরবর্তী সকল কৃষক বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ভান্ডার ও গৌরবময় প্রেরণার উৎস। এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, সমকালীন রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩) এবং পরবর্তীতে ১৮২৪-৩৩ সালের ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সাক্ষাৎ প্রভাব পড়েছিল।

পদটীকা সূত্রনির্দেশ

১. J. Spencer Triminghaum, *The Sufi Orders in Islam*, Oxford, London, 1971,P.97.

২. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufusm in Bengal*, Dacca,1975, P.482

৩. J.N. Fraquhar, 'The Organization of Sannyasis in the Vedanta', in the Journal of the Royal Asiantic Society of Great Britian Society of Great Britain and Ireland, 1925, P 482

৪. E.G. Glazier, *A Report on the District of Rangpore, Calcutta*, 1873, PP.88-89

৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯

৬. মুহম্মদ আবু তালিব, *ফকীর নেতা মজনু শাহ*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ, ৬৬

৭. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, পৃ, ২০

৮. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খন্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ২২

৯. Buchanan Hamilton, *Account of Rangpur, India Office Library and Records*, MSS Eur. D. 74, 1810, Book-1, P.76 (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মাইক্রোফিল্ম আকারে সংরক্ষিত)।

১০. মুহম্মদ আবু তালিব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

১১. James Rennel to Smuel Middleton, *Comptrolling Council of Revenue*, Seergunge, 1 march, 1777, in W.K. Firminger. 'Two Letters of Major James Rennell' *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, vol. ix, 1913, PP. 173-75

১২. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. viii, Trubner and com. London, 1877, P.20

১৩. Letter from the Committee of Circuit, 31 December 1772, quoted by *R, Jamini Mohan ghosh, Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal* Secretariat Book Depot, Calcutta, 1930, P.51

১৪. Revenue Department Original consultation, No 27, 29 October, 1793, quoted in *Jamini Mohan Ghosh*, op. cit, P.10

১৫. W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bangal*, Smith Elder and com. London, 1868, PP. 70-71

১৬. R.J.M. Ghosh, *op. cit.* P.10

১৭. A.N. Chandra, *The Sannyasi Rebellion*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1977, P.34

১৮. J. Rennell, *op. cit*

১৯. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুকওয়ার্ল্ড কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ-৩৭

২০. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত) *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬

২১. J.M.Ghosh, *op. cit.* P. 124

২২. Regulation formed by the Hon'ble the Governor General in Council,12 August, 1783, B. S.R.; Rangpur District Register of Letter Received, vol. 12, PP. 10-11

২৩. Collector of Dinajpur to Collector of Rangpur,24 March, 1788, B.S.R.Dinajpur District, Register of Letter Sent to ther Board of Revenue, vol. 344. PP.242-43

২৪. Letter from Warren Hastings, 8 July, 1773, quoted in W. R. Gourlay, *A Contribution Towards A History of the Police in Bengal*, Calcutta, 1916; A.N. Chandra, *The Sannyasi Rebellion*, Ratna Rrakashan, Calcutta, 1977; ইত্যাদি।

২৫. যাঁরা ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনকে জাতীয় চেতনার আলোকে প্রয়াস নিয়েছেন, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত রচনাগুলো উল্লেখ্যযোগ্য, W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, London, 1868; Lester Hutchinson, *The Empire of the Nabobs Calcutta*, সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা ১৯৬৬; নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা*, কলিকাতা, ১৯৫৪ ; নিখিল সুর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ*, কলিকাতা, ১৯৮২ ইত্যাদি।

২৬. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in colonial India*, Delhi, 1983; P. 333.